কৃষ্ণচরিত্র।

প্রথম ভাগ।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

Calcutta:

PRINTED BY JODU NATH SEAL,
HARE PRESS,
55, AMHERST STREET.

PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE,
2, BHOWANI CHARAN DUTT'S LANE.

1886.

তৃতীয় ঐ । কৃষ্ণজরাসন্ধসম্বাদ ১০৭
চতুর্থ ঐ । যুদ্ধ ... ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়। শিশুপাল বধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ। বিবাদ ১৩৭
দ্বিতীয় ঐ । বধ ... ১৫০

সপ্তম অধ্যায়। বন ও বিরাট পর্ব্ব।

ন ও বিরাট পর্ব্ব ১৬৪

অষ্টম অধ্যায়। যুদ্ধোদ্যোগ। ... ১৭১

নবম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ। সঞ্জয়যান ১৮৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। যান সন্ধি ১৯৪

সূচী।

প্রথম অধ্যায়। উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ১

দ্বিতীয় ঐ । মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ... ৪

তৃতীয় ঐ । বিচার প্রণালী ১১

চতুর্থ ঐ । ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? ... ১৩

পঞ্চম ঐ । মহাভারতের তিনস্তর... ... ২৫

ষষ্ঠ ঐ । বাল্যলীলা ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর।

প্রথম পরিচ্ছেদ। লক্ষ্যবেধ ৩৭

দ্বিতীয় ঐ । পাণ্ডবসাক্ষাৎকার ৪৫

তৃতীয় অধ্যায়। সুভদ্রাহরণ

তৃতীয় অধ্যায়। সুভদ্রাহরণ ... ৫৩

চতুর্থ অধ্যায়। খাণ্ডবদাহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ। বন পোড়ান ৬২

দ্বিতীয় ঐ । কৃষ্ণের মানবিকতা ... ৮১

পঞ্চম অধ্যায়। জরাসন্ধবধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ...

দ্বিতীয় ঐ । মগধযাত্রা ... ...

বিবেচনা করিয়া, আমি, আমার বক্তব্য কথা সকল গুলি বলিবার সময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে মনে স্থান দিয়া, দুই এক খানি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, এমন আশা আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকল গুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইবে না। কেন না সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণ চরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্ম ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ। কিন্তু অনুশীলন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবার ও বিলম্ব আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটী দুই খানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ম্ম বিষয়ক, দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক, তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ "নবজীবনে" প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় "প্রচার" নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধ গুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। সমাপ্তি দূরে থাকুক, কোনটি ও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেক গুলি কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না।

এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ পরিমাণ ও আপনার বয়স

কৃষ্ণচরিত্র।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচন প্রয়োজনীয়। কেন না, বাঙ্গালার ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ অতি বিস্তৃত স্থান অধিকৃত করিয়া আছেন। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।

আমার উদ্দেশ্য, প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণসম্বন্ধে কি কি কথা আছে এবং তাহাতে তিনি কি ভাবে স্থাপিত হইয়াছেন, তাহাই দেখাইব। বাকীটুকু পাঠক আপনি স্থির করিয়া লইবেন।

যে প্রাচীন গ্রন্থের কথা বলিতেছি, তাহা ছয়খানি। (১) মহাভারত, (২) ভাগবত, (৩) বিষ্ণুপুরাণ, (৪) ব্রহ্মপুরাণ, (৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৬) হরিবংশ। এই ছয়খানিতে কৃষ্ণকে কি ভাবে দেখান হইয়াছে এবং তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই লিখিব।

এই ছয়খানির মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেন মহাভারতকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিতেছি, তাহা সবিস্তারে বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ বড় বাড়িয়া যাইবে। এখন ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভাগবতেই আছে যে, উহা মহাভারতের পরে রচিত হইয়াছিল এবং মহাভারতের অসম্পূর্ণতা বশতঃই নারদের উপদেশ মতে ভাগবত রচিত হয়। হরিবংশ সম্বন্ধে আর কিছু বলা যাউক না যাউক, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হরিবংশ মহাভারতের উত্তরখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তরখণ্ড পূর্ব্বখণ্ডের যে পরবর্ত্তী, সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিষ্ণুপুরাণাদির পরবর্ত্তিতা আমি উপযুক্ত সময়ে প্রতিপন্ন করিব।

অতএব আমি প্রথমে মহাভারতের কৃষ্ণেরই পরিচয় দিব। মহাভারতে কৃষ্ণের যে জীবনী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে যাহা নাই, অথচ পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ; অনেক স্থল কাব্যের ভূষণোপযোগী কবি-কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

আবার কৃষ্ণের মহাভারতীয় চরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইবার আগে একটা কথার মীমাংসা করিতে হয়। মহাভারতের অপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থে কি কৃষ্ণের কোন প্রসঙ্গ নাই? থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষভাগে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদ তৎপূর্ব্বেই প্রণীত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল ইহাই সম্ভব। সুতরাং বেদে তাঁহার কোন প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে, অথচ কথাটা এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করা যায় না। কথাটা এই;—

"তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।" ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র

কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি (কথা) অবলম্বন করিবে "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

ইহাতে কেবল দুইটি কথা পাইলাম। (১) কৃষ্ণ দেবকীপুত্র। ইহাতেই বুঝা গেল যে, অন্য কোন কৃষ্ণের কথা হইতেছে না। (২) কৃষ্ণ ঘোরের নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবত্বসূচক কোন কথা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিবার সময়ে—একটা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা চাই—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি Historyই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে,

তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (রামায়ণকে আখ্যান বলিয়া থাকে।) যেখানে মহাভারত একাই ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই; তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথা গুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই, যে তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা

হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্‌তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক, যে ঐ সকল ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস গ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যে টুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সে টুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাস গ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থে ভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্ত্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে,

—মহাভারতেও সেরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাস গ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপি বিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ব্ব প্রথানুসারে গুরু শিষ্য পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই, যে রোম গ্রীশ বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাস গ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে, মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ, বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনাপ্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখন ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নাম মাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে, যে কে তাহার প্রণেতা তাহা আজি পর্য্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখকেরা, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহাদিগের রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। তবে, অবশ্য এমন কথা জিজ্ঞাস্য হইতে

পারে, যে যে গ্রন্থে কিছু সত্য আর অনেক মিথ্যা আছে, তাহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ মিথ্যা তাহা কি প্রকারে নিরূপণ করা যাইবে। সে বিচার পশ্চাৎ করা যাইতেছে।

ইউরোপিয়েরা মহাভারতকে "Epic Poem" বলিয়া থাকেন, দেখাদেখি এখনকার নব্য দেশীয়েরাও সেইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা বলিলেই মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সব উড়িয়া গেল। মহাভারত তাহা হইলে কেবল কাব্যগ্রন্থ, উহাতে আর কোন ঐতিহাসিকতা থাকিল না। এ কথারও বিচার করা যাউক।

কেন, মহাভারতকে সাহেবেরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমন হইতে পারে না, কেন না সর্ব্ব প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয় যে প্রকার সৌন্দর্য্য এপিক কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে এপিক বলেন। কিন্তু বিবেচনা

করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে। মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্য চরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই। মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। তাহা স্থানান্তরে বুঝান যাইবে।

স্থূলকথা, এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস মূলতঃ যে ঐতিহাসিক নহে, এমন বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করেন নাই; এবং নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এমনও বিবেচনা হয় না।

যদি মহাভারতের কোন অংশের ঐতিহাসিকতা থাকে তবে কৃষ্ণেরও ঐতিহাসিকতা আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচার প্রণালী।

মহাভারতের কোন অংশ অনৈতিহাসিক, বা প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিরূপণ করিবার কি কি উপায় আছে? পাঠকের বিচার সাহায্যের জন্য সেই লক্ষণগুলি একত্রিত করিয়া দিতেছি।

(১) যাহা অনৈতিহাসিক, স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক, তাহা অনৈতিহাসিক বলিয়া ত্যাগ করাই উচিত।

(২) যদি দেখি যে কোন ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণই পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তির দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

(৩) সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি

বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না তাহার অভাবে মহাভারতের মহাভারতত্ব থাকে না। দেখা যায়, যে সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায়, যে সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

(৪) মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। যদি মনে কর কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে স্থান বিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

(৫) যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত চারিটি লক্ষণের মধ্যে

কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্ব্বাচন প্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?

কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়।

এই প্রশ্নের ভিতর দুইটি তত্ত্ব আছে (১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কিনা। আমি এক্ষণে এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিবনা। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খ্রীষ্টীয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থূল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যীশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক-দিগের সঙ্গে।

ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর নির্গুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নির্গুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম

নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস, যে, এই ভাবুক ও পণ্ডিতগণও আমার মত নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না আমাদের সে শক্তি নাই।* মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শন শাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু "চতুষ্কোণ গোলক" মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হর্বর্ট স্পেন্সর এতকাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ("Something higher than Personality") তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নির্গুণ ঈশ্বরের

* "Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us."—Mansel, Metaphysics p. 384.

কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝকমারিতে কাজ কি?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকার?

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং শক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে, নিরাকার হইয়াও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দ্দেশ কর কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিতে চাও না? যিনি এই জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার জগৎ শাসনের জন্য, জগতের হিতজন্য, মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্ম গ্রহণ করিতে

হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহ্বায়াসে দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ ;—গর্ব্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তনপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত,—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (Manifestation) এ সকল তেমনি তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অসুরবধ অসুরবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্ত শক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস, শিশুপালও যে, একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মা বিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদ্গীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে :—

> "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
> ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। "ধর্ম্মসংরক্ষণ" কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয়? ধর্ম্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য, ও চরিতার্থতা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনুশীলন সাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্ম্ম

সাপেক্ষ।* অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্মপালন (Duty) বলা যায়।

মনুষ্য কতকটা নিজরক্ষা, ও বৃত্তিসকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্ম্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিক বৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না; কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্ম পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?

* মৎকৃত এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা নবজীবনে দেখ।

এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যও এই প্রকার।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯।
কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০।
যদ্যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১।
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মনি॥ ২২।
যদিহ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্যচ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪।"

গীতা, ৩ অ।

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তির তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্য করেন. তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান অনুবর্ত্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই

অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি *। যদি আমি আলস্য হীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদায় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।"

কালীপ্রসন্নসিংহের অনুবাদ।

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ির কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেষ্ট ও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও প্রয়োজন নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেই গুলি জগৎ-রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি, এবং এই গতিই জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্ত্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্ত-ক্ষেপণের বা কার্য্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য্য আছে,—উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল,

ধর্ম্মের উন্নতি। ধর্ম্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়ম-ফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে সে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বর কৃত হইলেও তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এসকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিয়া আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খ্রীষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টের পক্ষ সমর্থনের ভার খ্রীষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্য্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান্ পাঠককে ইহা বলা

বাহুল্য যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। সময়ান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণ-রূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে এই সকল অবতার পুরাণে কীর্ত্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস, ভণ্ডামি ও নষ্টামি স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক তাহার ভিতর অতি-প্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণ-সকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতি-প্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং এখন যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্য্য

সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।

তার পর অবিশ্বাসী বলিবেন, ভাল, মানিলাম, ঈশ্বর অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণ যে ঈশ্বরাবতার, তাহার প্রমাণ কি? সে কথা পরে বিচার্য্য। এখন কোন উত্তর দিব না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহাভারতের তিনস্তর।

শ্রীকৃষ্ণ, ঈশ্বরের অবতার হউন, বা না হউন, তিনি স্বয়ং কখন লোকের কাছে আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেন না। সত্য বটে, মহাভারতে ও অন্যান্য গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে, যাহাতে দেখিতে পাই, যে কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বিবেচনা করিয়া কথা কহিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পাঠক বোধ হয় ভুলিবেন না যে, মহাভারত, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ, বা হরিবংশ কবির কল্পনায় পরিপূর্ণ। সেই সকল কল্পনার মূলে একটু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে মাত্র। কল্পিত বৃত্তান্ত হইতে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যাধ্যমতে

বাছিয়া লওয়া উচিত। সে বিচার অতি কঠিন, নির্দ্দোষরূপে কখনই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে, ইহার কতকগুলি সদুপায় আছে। তাহার একটি এই যে, মহাভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কৃষ্ণ কথা আছে, ইহা স্মরণ রাখা। যদি এমন কথা পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাই যে, তাহা মহাভারতে নাই, তবে তাহা অনৈতিহাসিক এবং অমৌলিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এখন আমরা মহাভারতেও স্থানে স্থানে পাই যে, কৃষ্ণ আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচিত করিতেছেন। কিন্তু সমস্ত মহাভারত, যাহা এখন মহাভারত বলিয়া প্রচলিত, তাহা এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে রচিত হয় নাই, তাহা যিনি গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। আমি মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া, এই টুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে।—প্রথম, একটী আদিম কঙ্কাল—তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবন-বৃত্ত ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত—অন্ততঃ এখনকার মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে, বড় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়;—ইলিয়ড্ বা পারাডৈস্লষ্টের সঙ্গে

তুলনায় খুব বড় গ্রন্থ বটে। ইহাতে কেবল অতি প্রাচীন কিম্বদন্তী—অর্থাৎ "পুরাণ"—সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র। সেগুলি অধিক রঞ্জিত করিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। দ্বিতীয় স্তরে সেই প্রাচীন কিম্বদন্তী বা পুরাণগুলির বিশেষ সম্প্রসারণ—অনেক স্থানেই তাহার পুনরুক্তি হইয়াছে। এই দ্বিতীয় স্তরটি সমুদায় এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। ইনি প্রথম শ্রেণীর কবি—ইহাঁর সৃষ্টি-কৌশল অতি আশ্চর্য্য, চরিত্র-নির্ম্মাণ-শক্তি বিস্ময়কর,—রচনা মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রভাসিত সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় অনন্ত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট। মহাভারত জীবনী হইয়াও যে আদ্যোপান্ত অদ্ভুত ঐক্যবিশিষ্ট হইয়াছে—পাণ্ডুর অভিশাপ হইতে যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন পর্য্যন্ত যে জ্ঞানের অপেক্ষা কর্ম্মের প্রাধান্য, এবং কর্ম্মের অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখি, তাহা তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহিমাময়, প্রতিভাশালী সেই কবির কীর্ত্তি। যদি ব্যাসদেব নাম দিতে হয়, তবে ইহাঁকেই ব্যাসদেব বলিতে সম্মত আছি। কিন্তু এই কবি যে ভাবে ব্যাসদেবের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ব্যাসদেব বলা যায় না। ব্যাস নিজেই মহাভারতের একটি অতি ভাস্বর চিত্র। এরূপ মহিমাময় ঋষি-চরিত্র কোথাও দেখিতে পাই না।

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা 'অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদকে' বড় ভয় করিতেন। পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন, যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়, এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে। বরং যাহা সর্ব্বজন-

মনোহর এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি। * কিন্তু এই কারণে ভাল মন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব্ব, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগ পর্ব্বে প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর সঞ্চার কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্ব্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্ব্বের যে অংশ এবং বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।

এই তিন স্তরের নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত।

এক্ষণে মহাভারতের সর্বপ্রাচীন স্তর আলোচনা করিয়া, কৃষ্ণসম্বন্ধে আমরা এই কয়টি কথা পাই।

---

* স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং।

শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্ক। ৪ অ। ২৫।

(১) কৃষ্ণকে প্রথমাবস্থায় কেহ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করে না।

(২) ক্রমে অনেকে স্বীকার করে বটে, কিন্তু সে কথা লইয়া বড় বিরোধ উপস্থিত হয়। এক পক্ষে পাণ্ডবেরা—ভীষ্ম তাঁহাদিগের নেতা। দ্বিতীয় পক্ষের নেতা শিশুপাল, প্রথম বিবাদেই নিহত হয়েন, কিন্তু দুর্য্যোধন, কর্ণ, প্রভৃতি চিরকালই বিরোধী রহিলেন।

(৩) মহাভারতে এমনও আছে যে, যাহারা তাঁহার দেবত্ব স্বীকার করে, তাহারাও তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে নাই। অনেক স্থানেই তিনি ও অর্জ্জুন নরনারায়ণ নামক প্রাচীন ঋষির অবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত না হইয়া কেবল বিষ্ণুর মস্তকস্থিত একটি কেশের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, এক জন মনুষ্যের সহিত, তাহার মস্তকের এক গাছি চুলের যত প্রভেদ—ভগবান্ বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের ততটা প্রভেদ। এ সকল কথা, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। তবে ইহাতে বুঝায় যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মধ্যেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত হইত না।

(৪) তাঁহাকে কেহ অবতার বলিয়া স্বীকার করুক

বা না করুক, তিনি নিজে কখন আপনাকে অবতার বলিয়া পরিচিত করেন নাই, অথবা কাহারও সঙ্গে এমত ব্যবহার করেন নাই, যে, তাহাতে নিজের, ঈশ্বরত্ব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা বুঝা যায়। সত্য বটে, শান্তি পর্ব্বে এমন কথা দুই এক জায়গায় আছে, কিন্তু সে তৃতীয় স্তরে। সত্য বটে অন্যান্য স্থানে অর্জ্জুনের নিকট গোপনে—যথা, ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়ে, তিনি আপনাকে পরব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, কিন্তু সেও মহাভারতের তৃতীয় বা দ্বিতীয় স্তরে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরেও এমন কথা বড় দুর্লভ। সচরাচর কৃষ্ণ আপনাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়াই পরিচিত করেন—সামান্য মনুষ্যের মত ব্যবহার করেন। তিনি অপমানিত হইলে, অথবা পাপিষ্ঠের নিকট, তেজস্বী বটে, কিন্তু সচরাচর বড় বিনীত।

(২) তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কখন দৈব বা মনুষ্যাতীত শক্তির দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ করেন নাই। এমন কথা মহাভারতে যাহা আছে, তাহা তৃতীয় স্তরে।*

* "It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men—acting according to human

(৬) তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম-বৃদ্ধি। ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য তিনি দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন—(১) ধর্ম্মপ্রচার, (২) ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্ম্মপ্রচার তিনি বক্তৃতা দ্বারা করিতেন না।—আপনার জীবনের আদর্শের দ্বারা। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, তিনি অস্ত্রধারণ

---

motives and taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and of the unskilful manner in which these passages are often introduced, and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress."

Lassen's Indian Antiquities, quoted by Muir.

"In other places (অর্থাৎ ভগবদগীতা পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidely affirmed ; in some it is disputed or denied ; and in most of the situations he is exhibited in action, as a prince and warrior, not as a divinity. He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however is the work of various periods, and requires to be read through carefully and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated."

Preface to Wilson's Vishnu Purana.

পাঠক মনে ভাবিতে পারেন, আমরা বুঝি কৃষ্ণের দেবত্ব অস্বীকার করিব, নহিলে, শত্রুপক্ষের এ সকল মত সমর্থন করি কেন? তাহা নহে, শত্রুপক্ষের কথাতেই আমাদের মত প্রমাণীকৃত করিব। আমাদের মত, কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য। আমাদের ইহাও মত, যে ঈশ্বর ব্যতীত কেহ আদর্শ মনুষ্য হইতে পারে না। কেন না মনুষ্যমাত্রেই অসম্পূর্ণ।

করিয়া করেন নাই—পাপ পুণ্যের দণ্ডবিধানের দ্বারা। এই সকল কথা আমরা প্রচারে ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিব, ইচ্ছা আছে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ মনুষ্য-চরিত্র না ঈশ্বর-চরিত্র?—উত্তরে, আমাদেরও জিজ্ঞাস্য, পাঠকের কি বোধ হয়? কিন্তু আমরা এখন উত্তর চাই না। আমাদের কথাগুলি শেষ হইলে, পাঠককে জিজ্ঞসা করিব, পাঠকের কি বোধ হয়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাল্যলীলা।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার কোন বর্ণনা নাই। মহাভারতে তাঁহাকে দ্রোপদী স্বয়ম্বরে প্রথম দেখি, যদুবংশের নেতৃস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন, সুতরাং মহাভারতে বাল্যবৃত্তান্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ব্রজলীলা, গোকুল বৃন্দাবন, কংসবধ, মথুরা-জয় প্রভৃতির কোন কথা মহাভারতে নাই। কেবল যেখানে সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পরিচয় দিতেছেন সেইখানে কংসবধের ও মথুরার সামান্য প্রসঙ্গ আছে। ব্রজলীলার কোন কথাই নাই।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কৃষ্ণের এই আদিম জীবনী মধ্যে যাহার প্রমাণ না পাইব, তাহা অসত্য ও পরবর্ত্তী কবিদের কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে যে সকল স্তুতিবাক্যে আহূত করেন, তন্মধ্যে ব্রজনাথ ও গোপীজনবল্লভ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। সমগ্র মহাভারতে সবে এই একবার ব্রজ শব্দটি ব্যহৃত হইয়াছে। আর বনপর্ব্বে এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়ে যেখানে শিশুপাল ভীষ্মকে কৃষ্ণার্চ্চনার জন্য ভর্ৎসনা করিতেছেন, সেইখানে অনেকগুলি কথা পাওয়া যায়। ভীষ্মকে শিশুপাল বলিতেছেন,—

"যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের* প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পদদ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম্ম? না বাল্মীকপিণ্ড মাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন

* গোপাল অর্থে গোয়ালা।

হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই বিস্মিত হইয়াছ ?"

আর এক স্থানে শিশুপাল ভীষ্মকে বলিতেছেন,—

"এই বাসুদেবের পুতনাঘাত প্রভৃতি ক্রিয়া সকল কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে।"

এই কয়টি কথা ভিন্ন মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। একথা গুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা আমরা স্থানান্তরে দেখাইব।

আর আসল কথাটা পাঠককে বলিতেছি, মনোযোগ করুন। এই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতে ব্রজগোপী বা রাধিকার কোন প্রসঙ্গ কোথাও নাই। নামমাত্র নাই। ইঙ্গিতমাত্র নাই। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত করিতে হয় ? কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রজগোপীর কথা সব অমূলক, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সব মিথ্যা, সব পরবর্ত্তী পুরাণকারদিগের কাব্যকল্পনা মাত্র। যদি কৃষ্ণচরিত্রের এমন কদর্য্য পরিচয়ের কিম্বদন্তী মহাভারত প্রণয়ন কালে ঘুণাক্ষরেও প্রচলিত থাকিত, তবে শিশুপালের তিরস্কার বাক্যে তাহা অবশ্য সন্নিবেশিত হইত। শিশুপাল কৃষ্ণের যতগুলি দোষ দেখাইয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি গুরুতর হইত। যদি ইহার কিছুমাত্র

প্রবাদ প্রচলিত থাকিত, অদ্বিতীয় কাব্যকুশল মহাভারতের কবি কখনই তাহা ছাড়িতেন না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজগোপীর কথা একেবারে অমূলক। পরম পবিত্র কৃষ্ণচরিত্র এ দোষে দুষ্ট নহে।

তবে কথাটা আসিল কোথা হইতে? বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তা বা ভাগবতকার ইহা প্রথম প্রচার করিয়াছেন। আবার রহস্যের কথা এই যে, বিষ্ণুপুরাণকার ও ভাগবতকার সাধারণতঃ ব্রজগোপীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে রাধিকার নাম গন্ধও নাই; সে আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকারের সৃষ্টি।

এখন এই বহুতত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ কবি ও দার্শনিকেরা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এমন কদর্য্য কথার সৃষ্টি করিলেন কেন? কথাটা অনেকবার বুঝান হইয়াছে। বুঝিলে কথাটা আদৌ কদর্য্য নয়। আরাধনা শব্দ যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; রাধা শব্দও সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাধ—সাধনে, প্রাপ্তৌ, তোষণে, পূজনে। যে ঈশ্বর ভক্ত সেই রাধা। ভক্তে ও ঈশ্বরে যে অনুরাগ তাহাই রাধাকৃষ্ণের প্রেম। এ রূপকের তাৎপর্য্য পরে সবিস্তারে বুঝাইব।

—oo—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দ্রৌপদী স্বয়ম্বর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষবেধ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে দেখি। সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুই সূচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনিও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যবিন্ধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করে নাই। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর যে আদিম মহাভারত ভুক্ত, তদ্বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। আর দ্রৌপদী স্বয়ম্বর ব্যতীত মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। মহাভারতের কোন অংশ আদিম স্তর ভুক্ত কি না? এ কথা মীমাংসা করিতে হইলে আগে দেখিবে সে

অংশ বাদ দিলে মহাভারতের অবশিষ্টাংশ অসংলগ্ন হয় কি না। যদি হয় তবে বিচার্য্য অংশ আদিম মহাভারতভুক্ত বটে। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর তাই।

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। দুর্যোধন তাঁহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্ম রক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত।

এই সমবেত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশযুক্ত পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত মাত্র নাই। মনুষ্য বুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, "মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম বৃকোদর।" ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি প্রকারে তুমি

আমাদিগকে চিনিলে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুকান থাকে?" পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা, অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন, স্বাভাবিক মানুষ বুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন, ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের কার্য্যে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, যে তিনি মনুষ্য বুদ্ধিতেই কার্য্য করেন, বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতে ও আদর্শ মনুষ্য। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যের, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের তিনি, চরমাদর্শ। আমরা এই কথাই ক্রমে পরিস্ফুট করিব।

অনন্তর অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জ্জুন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। যতদূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে

অর্জ্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এই টুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার আত্মীয়, পিতৃস্বস্থপুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সাহায্যে নামিলে তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্ম্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই, যে কৃষ্ণ ধর্ম্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালিজাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখন অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্ম্মস্থাপন জন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্ম্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। কেবল কাশীরামদাস, বা

কথকঠাকুরদের কথায় মহাভারতে যাহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মূল। কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্ব্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায়, যে ধর্ম্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। নিজেও করেন নাই। তিনি যুদ্ধে সর্বপ্রধান বীর বলিয়া তৎকালেই স্বীকৃত। তাঁহার এইরূপ যুদ্ধে বিরাগ, এইরূপ নিয়মপূর্বক ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ, জীবনে বা কল্পনায় আর কোথাও দেখা যায় নাই। ঐতিহাসিক সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ আকবরে, কাব্যগত ধর্ম্মবীর-শ্রেষ্ঠ দেবব্রত ভীষ্মেও ইহা দৃষ্ট হয় না। কেবল এই আদর্শ মনুষ্যের দেখা যায়।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে বলিলেন, "ভূপালবৃন্দ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমারা ক্ষান্ত হও আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" ধর্ম্মতঃ! ধর্ম্মের কথাটাত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা-ধর্ম্মভীত ছিলেন; রুচিপূর্ব্বক কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্ম্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মবুদ্ধিই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম্ম কোন পক্ষে তাহা

ভুলেন নাই। ধর্ম্মবিস্মৃতদিগের ধর্ম্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্ম্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ। আমরা মহাভারতীয় কৃষ্ণ চরিত্রে ইহার অলঙ্ঘ্য প্রমাণ দেখাইব। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ;" প্রভৃতি দুই একটা কথা মাত্র যাঁহারা অবগত আছেন, এবং সে সকল কথা কোথা হইতে আসিল, তাহার সন্ধান করেন নাই, তাঁহাদের এই সকল কথা অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবে। কৃষ্ণের উপাসক ও কৃষ্ণনিন্দুক, উভয়েই কৃষ্ণের অবমাননা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের আধুনিক উপাসকেরা তাঁহাকে যে ভাবে চিন্তা করে, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়, আর যাহারা তাঁহার উপাসক নহে, তাহারা সেই নিন্দনীয় উপাসনা দেখিয়াই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। যাঁহাকে লম্পট, মিথ্যাবাদী, ক্রূরকর্ম্মান্বিত বলিয়া মনে জানি, তিনি কদাচ উপাস্য নহেন। এরূপ উপাস্যের উপাসনা অধর্ম্ম এবং আত্মাবনতি জনক। কৃষ্ণের যদি যথার্থ এইরূপ চরিত্র হয়, তবে কৃষ্ণোপাসনা দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়াই ভাল। আর তাহা না হইয়া তিনি যদি আদর্শ চরিত্র হয়েন, তবে তিনি মনুষ্যই হউন, আর দেবতাই হউন, ভক্তির পাত্র। কেবল মনুষ্য হইলেও, যে অর্থে আত্মোন্নতির জন্য উন্নতস্বভাবের

প্রতি ভক্তি ও তদালোচনাকে উপাসনা বলা যায়, উপাসনার সে অর্থে আদর্শ মনুষ্য উপাস্য। তার পর তাঁহার সমুদায় চরিত্রের আলোচনা করিয়া যদি কাহারও এমন বিশ্বাস জন্মে যে এই আদর্শ মনুষ্য ঈশ্বরের অবতার, তিনি তাঁহাকে অবশ্য সেই ভাবে উপাসনা করিবেন। যাহার সে বিশ্বাস না জন্মিবে, তাহার সে ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করা অনুচিত। আমরা কাহাকেও কৃষ্ণোপাসনায় অনুরোধ করি না ও করিব না। বরং যেখানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানে উপাসনা নিষেধ করি। বিশ্বাসের অভাবে, পরের দেখিয়া, পরের মতে মত দিয়া, উপাসনা করা চিত্তের অবনতিকর। আমরা কেবল চিন্তা ও সমালোচনা করিতে বলি। চিন্তা ও সমালোচনার ফল যাহা হইবে, তদনুসারে কার্য্য করিতে বলি। মনে এক, মুখে আর ইহা যেন না হয়। যেমন বুঝিবে, তেমনি করিবে, তাহাতে কোন সঙ্কোচ বা ভয় করিও না।

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডব সাক্ষাৎকার।

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কি করা কর্ত্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ফুরাইল, উৎসব যাহা ছিল তাহা ফুরাইল, কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া বলদেবকে সঙ্গে লইয়া যেখানে ভার্গব কর্ম্মশালায় ভিক্ষুক বেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন, সেই খানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে কখন সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না, কেন না মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে "বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।" বলদেবও ঐরূপ করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে

পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃস্বসৃপুত্র বলিয়াই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ লৌকিক ব্যবহার অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কেন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয় পূর্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহ সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি "কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদুর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটী

কোটী রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।" এ সকল পাণ্ডবদিগের তখন ছিল না; কেন না তখন তাঁহারা ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন। অথচ এসকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির "কৃষ্ণ প্রেরিত দ্রব্য সামগ্রী সকল আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।" কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তার পর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। যে প্রকারে দৈবগতিকে পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্ত মাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রত স্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্ম্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রুর এবং পাপাচারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকিলে এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থূল কথা এই, যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সদ্বৃত্তির ন্যায় প্রীতিবৃত্তি ও পূর্ণবিকশিত ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ,

যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্ব্ব বর্জ্জিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম—বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবঞ্চ দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খুঁজিয়া লইয়া, আপনার কার্য্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্য্যটি একটি ক্ষুদ্র কার্য্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদমায়েসেও চেষ্টা চরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা। তাই, আমরা কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে কেবল "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া,

যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা এবং প্রক্ষিপ্ত, তাহা দ্রোণবধ পর্ব্বাধ্যায় সমালোচনা কালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

এই বৈবাহিক পর্ব্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বড় তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। দ্রুপদরাজ কন্যার পঞ্চস্বামী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে, একটী উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটী রুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে তুমি কেন কাঁদিতেছ? তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে "আইস দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও

ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহার মত আর চারিটী ইন্দ্র আছেন! শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও। সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ব্ভে উৎপন্ন করুন!!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে তুমি গিয়া ইহাদিগের পত্নী হও। সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর কোন খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে নারায়ণ এই কথা শুনিবা মাত্রই আপনার মাথা হইতে দুই গাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। এক গাছি কাঁচা, এক গাছি পাকা। পাকা গাছটি বলরাম হইলেন, কাঁচা গাছটি কৃষ্ণ হইলেন!!!

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে এই উপাখ্যানটী, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ উপখ্যানটীর রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর উপন্যাস

লেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যান সৃষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই উপখ্যানটীর সমুদয় অংশ উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। দ্রুপদ রাজের আপত্তি খণ্ডন জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না ঐ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটী উপখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান ঐ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটী ইহার বিরোধী। দুইটীতে দ্রৌপদীর পূর্ব্ব-জন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটী যে প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটীই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত

আছে, যে পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনী কুমার-দিগের ঔরস পুত্রমাত্র। এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপখ্যানরচনা-কারী গর্দ্দভ লিখিয়াছেন যে ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন। জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দ্দভের লেখনী প্রসূত নহে, ইহা নিশ্চিত।

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটীর এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটী স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই; তা ছাড়া একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বও ইহাদ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্য্যের মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্ত্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দু ধর্ম্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈবদ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া

মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেননা এখানে মহাদেবই সর্ব্বনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটী কেশ মাত্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাইব। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাইব, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার কারণ পাইব। যদি একথা যথার্থ হয় তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে এই বিবাদ আদিম মহাভারত প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনা উভয়েই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারত প্রচারের সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা কতকটা বেদের প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল; তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিব মাহাত্ম্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণ মাহাত্ম্যসূচক সেই রূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। অনুশাসনিক পর্ব্বে

এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। যথাকালে তাহার সমালোচনা করিব। তখন দেখিতে পাইব, প্রায় সকল গুলিতেই একটু একটু গর্দ্দভের গাত্রসৌরভ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুভদ্রাহরণ।

দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে—তাহা সকল শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এদেশে অনেকেই একব্বরি গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি

কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটী হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি। আমরা সেই একঝরি গজ চালাইব।

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর, যে এই সুভদ্রা হরণ বৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল —এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে সুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথমস্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার রচনা অতি উচ্চ শ্রেণীর কবির রচনা বটে,—কিন্তু কেবল সেই কারণেই ইহা দ্বিতীয় স্তরভুক্ত বিবেচনা করা যায় না। প্রথমস্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর। তবে প্রথমস্তর ও দ্বিতীয়স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথমস্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয়স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা প্রথমস্তর গত—দ্বিতীয়স্তরের নহে।

আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমন্যু হইতে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রার্জ্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল—দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদী স্বয়ম্বর বাদ দেওয়া যায় তবু সুভদ্রা হরণ নয়। হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে সুভদ্রার বিবাহ মহাভারতে কথিত হয় নাই সুতরাং ইহাই মৌলিক মহাভারতের অংশ।

এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশী দাসের গ্রন্থে, অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালানাটকাদিতে যে সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভুলিয়া যাউন। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবর্ত্তিনী দূতী হইলেন, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথি হইয়া গগণমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিল—সে সকল কথা ভুলিয়া যান।

এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নহে। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি কি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কথকদিগের সৃষ্টি তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন কারণে অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য দেশ পর্য্যটনান্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহাকে বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অর্জ্জুন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্ব্বতে একটা মহান্ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদু কুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে?" অর্জ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাঁহার

মহিষী হন তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই :—

"হে অর্জ্জুন! স্বয়ম্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ম্বরকাল উপস্থিত হইলে, তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ স্বয়ম্বর কালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে।"

এই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অর্জ্জুন প্রস্থান করিলেন।

এখন আজি কালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে

কেহ যদি অপর কাহাকে বলে "মহাশয়! আপনার যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ," তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতি শাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না) কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সুভদ্রা হরণ পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায় কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্ম্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার।

সমাজ রক্ষার মূলসূত্র এই যে কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থিকৃত কন্যাহরণকে নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ অপহৃতা কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা যাক। কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্ব্বোতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য—তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার "Duty"। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল—সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বলিলেও হয়—সৎ পাত্রস্থ হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান "ডিউটি"—তিনি যাহাতে সৎ পাত্রস্থ হয়েন, তাহাই করা। এখন, অর্জ্জুনের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি

যাহাতে অর্জ্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ তাঁহার করা কর্ত্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্ত্তব্য সাধন হইতে পারিত কিনা তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গল সিদ্ধি নিশ্চিত সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ সুভদ্রার চিরজীবনের পরমশুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি পরমধর্ম্মানুমত কার্য্যই করিয়াছিলেন—তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও আমার উপর বল প্রয়োগ করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরহিত মহাশয় মনে করেন, যে আমি যদি আমার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাঁহার এমন কোন অধিকার নাই, যে আমাকে মারপিট করিয়া সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয়। ঊনবিংশ

শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে "the end does not sanctify the means."

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সুভদ্রার যে অর্জ্জুনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা—কুমারী এবং বালিকা—পাত্র বিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্র বিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা লজ্জা বশতঃ বা উপায়াভাব বশতঃ আমি সে কার্য্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু বল প্রয়োগের ভান করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্ম্ম? মনে কর একজন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু, বড় ঘর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি

তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফ্তর খানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি "এসো গো" বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভান ভিন্ন তাহার মঙ্গল সাধনের উপায়ান্তর ছিল না।

"আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।" এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা ঐ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীয় উত্তর এই, যে কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্য্যে আমার পরম মঙ্গল, সে কার্য্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটেনা। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ

যায় কিন্তু রোগীর স্বভাবসুলভ ঔষধে বিরাগবশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাটাইবে না,—জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবেনা, জোর করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, বলপূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত করে, তবে কোন্ পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্যা সৎপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?

এই গেল প্রথম আপত্তির দুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে, যে ভাল, স্বীকার করা গেল, যে কৃষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গলকামনা করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কিন্তু বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন কি তাঁহাকে অর্জ্জুন মহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ম্বরে যেন ভয় ছিল, যেন, মূঢ়মতি বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ন্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন, বসুদেব প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয়া রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাঁহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদবেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না। এবং অর্জ্জুনও সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন?

এখনকার দিন কাল হইলে, একাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জ্জুনের বিবাহ চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহ প্রথার মত ছিল না। সেই বিবাহ প্রথা না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না।

মনুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম,

(২) দৈব, (৩) আর্ষ, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন।

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ বিবাহে অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্ত, ক্ষাত্রস্ত চতুরোঽবরান্।

ইহার টীকায় কুল্লুকভট্ট লেখেন, "ক্ষত্রিয়স্য অবরানুপরিতানাসুরাদীংশ্চতুরঃ।" তবেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। আর সকল অবৈধ।

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে—

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব নকর্ত্তব্যৌ কদাচন।

পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্ত্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল।

তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ "কামসম্ভব," সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জ্জুনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে

না। অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনুর ৩ অ ২৪ শ্লোকে আছে—

চতুরোব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

যে বিবাহ ধর্ম্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিণীর ও ভগিণীপতির গৌরবার্থ ও নিজ কুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা অভ্রান্তবুদ্ধি এবং সর্ব্বপক্ষের মান সম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যায্য বটে; তত প্রাচীন কালে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিনা সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে

মনুসংহিতা পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি নীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ঐরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাই পারুক —মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রা হরণ পর্ব্বাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খুঁজিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া যাদবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, অর্জ্জুন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে, বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

"অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়া অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা

অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের কুলোচিত হইয়াছে। এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই।"

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন;

১। অর্থ (বা শুল্ক) দিয়া যে বিবাহ করা যায় (আসুর)।

২। স্বয়ংবর।

৩। পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য)।

৪। বলপূর্ব্বক হরণ (রাক্ষস)।

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্ত্তি ও অযশ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ আছে।*

* মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে যে বিবাহতত্ত্ব আছে, তাহার আমরা

ভরসা করি এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই যে সিদ্ধান্ত করেন, যে আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে "রিফর্মরই" আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য তবে মালাবারী ধরণের রিফর্মর হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল! কিন্তু আমরা মালাবারী ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।

আমরা বলিয়াছি, যে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি

কোন উল্লেখ করিলাম না, কেননা উহা প্রক্ষিপ্ত। উহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা আমরা অনুশাসন পর্ব্বের সমালোচনা কালে প্রমাণ করিব। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীষ্ম স্বয়ং, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশীরাজের তিনটী কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভীষ্ম রাক্ষস বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীষ্মের চরিত্র এই যে যাহা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সে কবি কখনই তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই।

অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাহাদিগের কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অর্জ্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার সে কথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া, সমারোহ পূর্ব্বক তাহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের আর আবশ্যকতা নাই।

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজ মধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয় কৃত এই বল প্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই, যে আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজ সম্মত, তদ্দ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।

আমরা এই তত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্ণদ্বেষিরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে ছোট মাপ কাটিটী আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপ কাটিতে মাপিলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেআপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের সেই একঝরি গজ বাহির করা চাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

খাণ্ডবদাহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন পোড়ান।

সুভদ্রাহরণের পর খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানীর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন, তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটা এই। গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম।

পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বড় যাজ্ঞিক ছিলেন। চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ করিতে করিতে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা হায়রাণ হইয়া গেল। তাহারা আর পারে না—সাফ জবাব দিয়া সরিয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিলেন—তাহারা বলিল এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না—তুমি রুদ্রের কাছে যাও।

রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন—রুদ্র বলিলেন, আমরা যজ্ঞ করি না—এ কাজ ব্রাহ্মণের। দুর্ব্বাসা একজন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমারই অংশ—আমি তাঁহাকে বলিয়া দিতেছি। রুদ্রের অনুরোধে, দুর্ব্বাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর যজ্ঞ—বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির Dyspepsia উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, ঠাকুর! বড় বিপদ—খাইয়া খাইয়া শরীরে বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি? ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি করিলেন, তাহা *Similia Similibus Curanter* হিসাবে। তিনি বলিলেন, ভাল, খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও। খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল—পীড়া আরাম হইবে। শুনিয়া অগ্নি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারিদিকে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত—হাতীরা শুঁড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা করিয়া জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষীগণ মিলিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আগুন সাতবার জ্বালিলেন, সাতবার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,

আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার? তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনাটি—জানাইলেন—খাণ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে—খাইতে দেয় নাই। তখন কৃষ্ণার্জ্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতি বৃষ্টিতে ফশল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে পারিত। যাই হোক—ইন্দ্র চটিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুনকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছুড়িয়া মারিলেন—অর্জ্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইলওয়ে টনেল করিবার বড় সুবিধা হইত)। শেষ ইন্দ্র বজ্র প্রহারে উদ্যত—তখন দৈববাণী হইল যে ইঁহারা নরনারায়ণ প্রাচীন ঋষি। *

* পাঠক দেখিয়াছেন, একস্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন ঋষি, আবার দেখিব তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথার সামঞ্জস্য চেষ্টায়

দৈববাণীটা বড় সুবিধা—কে বলিল তার ঠিকানা নাই—কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পশু পক্ষী পলাইতে ছিল, সকলকে তাঁহারা মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্নি ভাল হইল—(আমাদের হয় না কেন?) তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনকে বর দিলেন। পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খুসী হইয়া ঘরে গেলেন।

এরূপ অত্যুক্তি—এরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার, মহাভারতের প্রথম স্তরে বড় দেখা যায় না। দ্বিতীয় স্তরে ইহার বাহুল্য। অনেক কারণে এই খাণ্ডবদাহ পর্ব্বাধ্যায়ের অধিকাংশ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা কোন স্তরের অন্তর্গত তাহা বিচার করিবার বড় প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। প্রথম স্তরগতই হউক আর দ্বিতীয় স্তরগতই হউক, এরূপ আষাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়।—অন্য লাভ নাই। আর

যা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের এখন সমালোচ্য।

আমাদের যাহা সমালোচ্য—অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র,—তাহার ভাল মন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য থাকে তবে সে টুকু এই যে, পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জ্জুন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারিরা নিত্য তাহা করিয়া থাকে।

আমরা স্বীকার করি, যে এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টাল্‌বয়স্‌হুইলরি ধরণের হইল। কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য্য সূচিত করিতে বাধ্য হইলাম তাহার কারণ আছে। খাণ্ডব দাহটা অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরান্তর্গত হউক, কিন্তু স্থূল ঘটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। কেন না, এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভা পর্ব্বের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অর্জ্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জ্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের

প্রত্যুপকার জন্য ময়দানব পাণ্ডবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা-নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সেই সভা লইয়াই সভাপর্ব্বের কথা।

এখন সভাপর্ব্ব অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে এক পর্ব্ব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তদুপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা ঐতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্ম্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়রের নাম ময়। হয় ত সে অনার্য্য বংশীয়—এজন্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে সে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতা বশতঃ এই এঞ্জিনিয়রী কাজ টুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয় তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাণ্ডবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে এ সকলি কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা। তবে

অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অন্ধকারেও ঢিল।

হয় ত, ময়দানবের কথাটা সমুদয়ই কবির সৃষ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি যে ভাবে কৃষ্ণার্জ্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া, অর্জ্জুনকে বলিলেন, 'আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?' অর্জ্জুন কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না; কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন,

"হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।"

ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম; ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর প্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অর্জ্জুন বাক্যের অপরার্দ্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম্ম আরও স্পষ্ট

হইতেছে। ময় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জ্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,

"তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় 'দানব কুলের বিশ্বকর্ম্মা' —বা চীফ ইঞ্জিনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নির্ম্মাণ কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।"

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্ম্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্ম্মাণ ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সূত্র।

এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভা সংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে তিনি সমাজ সংস্থাপক বা Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন, (Moral and Political Regeneration) ধর্ম্ম প্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজ-সংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন—জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা তাহা জানি না—আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একটা পৃথক জিনিষ বলিয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজ সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণপদ্ধতিটা যদি

ইংরেজি ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুগ তার বড় ভাল লাগে। সমাজ সংস্করণ আর কিছু হোক না হোক, একটা হুজুগ বটে। হুজুগ বড় আমোদের জিনিষ। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি; ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত, সমাজ সংস্কার কিসের জোরে হইবে? রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজ সংস্করণের পৃথক চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজ সংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণের মানবিকতা।

কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচন করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কিনা তাহা আমি এখন কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের এখন কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি

পাঠককে সে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধিও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখানা নহে —তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, একথা আমি মনে করি না। ধর্ম্ম একবস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌঁছিবার অনেক পথ আছে—কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রীষ্টিয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে। * অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে আমি তাঁহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি যে কৃষ্ণদ্বেষীও আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না।

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, যে আমরা যে তাঁহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন করিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। আমরা তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনুষ্যাতীত কোন প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিসিদ্ধ হইল। এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মনুষ্যস্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য্য করিবেন। তিনি

* "ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অ।

কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। কেন না,. মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে? *

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবে না। যদি এরূপ কথা কোথাও থাকে তবে, যাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের হয় স্বীকার করিতে হইবে, যে কৃষ্ণ ঈশ্বর নহেন, নয় দেখাইতে হইবে যে ঐ সকল প্রবাদ

* "We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting him where he can be no example to us at all. Let no fear of losing the dear great truth of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature; as a man of the like passions, he fought that terribie fight in the wilderness; year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature; a humanity which, though given up to death on the cross, expressed all that is within the capacity of our own humanity; and if we really follow him we shall be holy even as he is holy."

Sermon by Dr Brookly, delivered at Trinity Church, Boston March 29th, 1885.

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।

অমূলক। কেননা মনুষ্য ধর্ম্মের আদর্শপ্রচার ভিন্ন আর কোন কারণে ঈশ্বরের মনুষ্য-দেহ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না।* কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই, যে তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন নাই। বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যথাসাধ্য পুরুষাকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।" †

তিনি যত্নপূর্ব্বক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত

* যে দুই একস্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

† উদ্যোগ পর্ব্ব ৭৮ অধ্যায়।

আচারের উপরে চড়ে। কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণ স্বরূপ, তিনি খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুষিক।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান বাসুদেব পরম প্রীত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন। তখন বাসুদেব সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিনী ভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডবকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তি-বাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহা-দিগকে ধন দান পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্র যুক্ত মুহূর্ত্তে গদা চক্র অসি শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব ঋত্বিক ও পুরোহিত-গণ সমভিব্যাহারে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে

অর্দ্ধ যোজন গমন করিয়া শক্রনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান বসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি কষ্টে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জন পরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও পরম আহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর

তিনি প্রদ্যুম্ন শাম্ব নিশঠ চারুদেষ্ণ গদ অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জরাসন্ধ বধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

এদিগে সভা নির্ম্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়েই মত করিল কিন্তু যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক—কেননা কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে সম্রাট্ না হইলে রাজসূয় যজ্ঞ করা হয় না। মগধাধিপতি জরাসন্ধই তখন সম্রাট—জরাসন্ধকে জয় না করিলে

রাজসূয় যজ্ঞ হইবে না। জরাসন্ধ জয়ের পরামর্শের স্থূল মর্ম্ম আমরা পরে বলিব। এক্ষণে জরাসন্ধের পূর্ব্ব পরিচয় বিষয়ে কৃষ্ণ যাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, তাহার প্রতি প্রথমে মনোযোগ আবশ্যক। কেননা ইহাতে কৃষ্ণের নিজের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু আছে। অতএব ইহা কৃষ্ণচরিত্র সমালোচকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কৃষ্ণ কহিতেছেন।

"কিয়ৎকাল অতীত হইল দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্রদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব

না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিলেন।

*　　*　　*　　*

"কিয়দ্দিনান্তর পতিবিয়োগ-দুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার পতিহন্তাকে সংহার কর বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধন সম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি—তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথদিগের কথা দূরে থাকুক স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতকপর্ব্বত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রব ভয়ে পর্ব্বত আশ্রয়

করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণসকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব সাত্যকি আমি বলভদ্র যুদ্ধবিশারদ সাম্ব, আমরা এই সাতজন রথী, কৃতকর্ম্মা অনাধৃষ্টি সমীক সমিতিঞ্জয় কঙ্ক শঙ্কু ও কুন্তি এই সাতজন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশজন মহাবীর, ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যমদেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।”*

এই কৃষ্ণকথিত পূর্ব্ববৃত্তান্ত হইতে আমরা কয়টি কথা লইতেছি।

১। কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনকাল সম্বন্ধে যে ইতিহাস প্রচলিত, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম হইবামাত্র কংসভয়ে বসুদেব তাঁহাকে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন, সেই খানে তিনি বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেন, তারপর অক্রূর গিয়া তাঁহাকে কংসবধার্থ মথুরায় আনেন, এ সকল অমূলক।

* বলা বাহুল্য যে এই অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত। মূলের সঙ্গে মিলান হয় নাই।

কংস যে তাঁহার মাতুল নহে, কংস যে দেবকীপুত্র দ্বারা নিধন শঙ্কায় দেবকীকে কারারুদ্ধ রাখেন নাই, ইহাও বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে। তবে কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে পলাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বটে, কেন না কৃষ্ণ বলিতেছেন, যে "ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ কংসের দৌরাত্ম্যে ভীত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।" কৃষ্ণ যে তাহা না করিয়া কংস বিনাশ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধন করিয়াছিলেন, ইহাও দেখা যাইতেছে। স্থূল কথা ব্রজলীলার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অমূলক দাঁড়াইতেছে।

২। তিনি ঈশ্বর হইলেও, ঐশী শক্তির দ্বারা কোন কাজ করেন না, মানুষী শক্তির দ্বারা কাজ করেন। ঐশীশক্তির দ্বারা ইচ্ছাক্রমেই জরাসন্ধকে নিরস্ত করিতে পারিতেন।

৩। যেখানে যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধের ফলসাধন হইতে পারে, সেখানে যুদ্ধে তিনি প্রবৃত্তিশূন্য।

৪। কৃষ্ণ বিনীত। নিজ সম্বন্ধে তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট যাহা বলিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র আত্মগৌরব প্রকাশের চেষ্টা নাই। বরং আপনার কাজ বর্ণনকালে যত অল্প কথা ব্যবহার করা যায়, তাহাই করিয়াছেন।

যিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র মনে করেন, বোধ করি তিনিও এ ন্যায্য কথা স্বীকার করিবেন। আর যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি ইহাতে দেখিবেন যে কৃষ্ণ মনুষ্যশরীরেও জীবের প্রতি দয়াময়, নিঃস্বার্থ, অথচ দুষ্টের দণ্ডপ্রণেতা এবং রাজনীতির আদর্শ স্বরূপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মগধযাত্রা।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন।

"আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং তিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে—"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের

ভুজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনাআপনি পায় না। দাম্ভিক ও দুরাত্মাগণ খুব বড় মাপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন বটে, যে আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রীগণ ও ভীমার্জ্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?" তাঁহারা বলিয়াছেন—"হাঁ অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।" ধৌম্য দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন আমি কি রাজসূয় পারি?" তাঁহারাও বলিয়াছিলেন "পার। তুমি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।" তথাপি সাবধান * যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জ্জুন

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, যে যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দুঃসাহসী "গোঁয়ার", অর্জ্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব জানিয়া নির্ভয় ও

হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই "মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন।" তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই, তাঁহাকে পূর্ব্বোদ্ধৃত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন।

"আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন নাই। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার

নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। ধার্ম্মিক তিন জনেই, কিন্তু ভীমের ধর্ম্ম দুইপাদ, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম তিনপাদ, অর্জ্জুনেরই ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রা। মহাভারতকার স্বয়ং অথবা যিনি মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব লিখিয়াছেন, তিনি ঠিক এরূপ মনে করেন না—তিনি বয়োনুসারে ধর্ম্মের অনুপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। যুধিষ্ঠির যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সাবধানতা তাহার একটি কারণ। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই অসাবধানতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।”

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিবেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।* আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি। তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব্বদোষরহিত, সর্ব্বলোকোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ—আমরা জানি তিনি লম্পট, ননিমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্ম্মের চরমাদর্শ, তাঁহাকে যে জাতি এই পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া, যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, তুমি রাজসূয়ের অধিকারী

* যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই সকল কথা গুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। তবে সমকালিক ইতিহাসে এই রূপ ছায়া পড়িয়াছে। ইহাই যথেষ্ট।

নও, কেননা সম্রাট ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকার হয় না, তুমি সম্রাট নহ, মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পারনা ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।"

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, "বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরে মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।" রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পূর্ব্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখন নরবলি দিত, তাহা

ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না। * কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপ্রতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধকে ঐ ক্রূর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।"

অতএব জরাসন্ধ বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ একস্থানে বলিতেছেন, "আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক দিয়া যাইতেন না।

লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়, জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোক হিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্য্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর, এবং অধার্ম্মিক, কেননা তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন তিনিই আদর্শ ধার্ম্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজন জরাসন্ধ জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশ

রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শ চরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে, যে তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধী-দিগের হত্যা, আর হয় ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি, কেন না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়-গণের এই ধর্ম্ম ছিল যে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না। অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিনজন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত করিবেন—যে তিন জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস, ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসজ্জায় এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার

তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়া জরাসন্ধ সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটী কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে ভীমার্জ্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাঁরা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্ম্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে এত দিন আমরা ধর্ম্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য

থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি, যে হাঁ, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, ইহাঁরা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রু নিপাত করিবেন বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে ইহাঁরা ধর্ম্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য। তাই ইহাঁরা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, এবং এরূপ কোন কার্য্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথ-কালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথ-কালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই, প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও

মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, একজনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি "অন্যায় যুদ্ধ" বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্ত্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্য্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিলেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্ব্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন আর যাহাই

হউন, নির্ব্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ পর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল। ইহা কি কেহ বনাইয়া দিয়াছে? এই কথা গুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমরা দেখিয়াছি যে মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায় কোন স্থানে কোন একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটা পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায়ের অংশ বিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া

যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে তাহার বিচিত্র কি?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে, যে প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ —অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে, যে সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌টি প্রক্ষেপ, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে লেখা আছে যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু

যদি দেখি যে এমন লেখা আছে, যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া মিট্‌মাট্‌ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের বিচার্য্য, তাহা ঐ পর্ব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে, যে তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথা গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথা গুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি, যে মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই

দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনা প্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধ পর্ব্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্ব্বগুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহাঁর নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্ল ভ নয়! এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিস্মার্ক এখন জগতের প্রধান মনুষ্য। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু তাঁহারাই ইউরোপে মান্য—Francisd, Assisi বা Imitation of Christ' গ্রন্থের প্রণেতা কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই

তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথ বধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা। তাহা আমি ঐ সকল পর্ব্বের সমালোচনা কালে বিশেষ প্রকারে দেখাইব। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে জরসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায় এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশল বিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে, হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণ জরাসন্ধ সম্বাদ।

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতক বেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতক ব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য * বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে;

* লিখিত আছে যে মাল্য তাঁহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের এত ঐশ্বর্য্য যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাঁহারা কপট দ্যূতাপহৃত রাজ্যই ধর্ম্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন. তাঁহারা যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ জানায়।

আকার দর্শনে ক্ষত্র তেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন।"

তদুত্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে; (মহাভারতে কোথাও দেখি না যে কৃষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) "হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ

করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্‌ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে।"

কথা গুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এই রূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচূড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা শত্রু ভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন।

"বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীরব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে এবং সুহৃদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্!

আমরা স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না ; এই আমাদের নিত্যব্রত।”

কোন গোল নাই—সব কথা গুলি স্পষ্ট। এই খানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তার পর, পর অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এবং পর অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ, যে দুই হাতের বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, “আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ।”

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা তাহাই বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না।

নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাঁহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, শত্রুমিত্র সমান। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদ এবং, কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যে তিনি ধর্ম্মের পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তদ্ভিন্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেননা আদর্শ পুরুষ সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। শত্রুতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন,—

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও তৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় অক্ষরে লিখিলাম। এখন পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর। যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। "আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?" যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপ নিবারণ ব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাহাদের জীবনচরিতের মূল সূত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল

কার্য্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা "পৃথিবীর ভার হরণ" বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক এই পাপ-নিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এক বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা, দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্য সকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খ্রীষ্ট, শাক্যসিংহ, ও শ্রীকৃষ্ণ এই বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খৃষ্টকৃত ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য প্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে।

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী তিনি পাপাত্মাকেও আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে, জগতের

মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধ সাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এক কালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যীশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ম্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্র ভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের যাহা সাধ্য তাহা আমি করিতে পারি, কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কার্য্য করিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ন করিয়াও কখন কখন নিষ্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংস বধের কাণ্ডটা কি, তাহা জানিবার

কোন উপায় নাই, কেননা মহাভারতে কংসবধ দুই ছত্রে সমাপ্ত। তবে ইহা বুঝা যায়, যে যে বধোদ্যত শত্রুর ভয়ে জ্ঞাতিবর্গ কৃষ্ণকে পলাইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে যুদ্ধত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতে গেলে, সেইখানেই কৃষ্ণলীলা সমাপ্ত হইত। পাইলেটকে খ্রীষ্টিয়ান করা, খ্রীষ্টের পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল, তৎসঙ্গে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে ততদূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্ম্মবিষয়ক একটি লেক্‌চর শুনাইয়া দিল, যথা—

"দেখ ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই। ইত্যাদি"

এ সব স্থলে ধর্ম্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার জন্য উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষ কীর্ত্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয় একটা কাণ্ড হইতে

পারিত। তেমন অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুজরুকী ভেলকির দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার বা আপনার দেবত্ব স্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি, যে জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্ম্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দ্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, "আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডু তনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।" অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যীশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য্য। যীশু বা শাক্যের

ব্যবসায়ই ধর্ম্ম প্রচার। কৃষ্ণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের আদর্শ জীবন নির্ব্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন; যে যীশুখ্রীষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যীশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি, এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্ম্মই তাঁহার "ব্যবসায়," অর্থাৎ অন্য কর্ম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যীশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন কিন্তু মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোক হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন,

এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক "আদর্শ" শব্দটি "Ideal" শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দূষ্য হইবে না। এখন একটা "Christian Ideal" আছে। খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যীশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শপুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইহাঁদিগকে আমরা আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ। সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? Hindu Ideal আছে না কি? যদি থাকে তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেই মস্তক কণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত জটা বল্কল ধারী শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফ বিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, ও ছাই ভস্ম নাই। নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল।—তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, নবজীবনে তাহা বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু যথার্থই হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্টাদিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, নবজীবনে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যযুক্ত তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে।

যীশুকে যদি রোমক সম্রাট্ য়িহুদার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেননা রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরিভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসন কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—এই জরাসন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর যদি য়িহুদীরা রোমকের অত্যাচার পীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যীশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যীশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—"Christian Ideal" অপেক্ষা Hindu Ideal শ্রেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্য্য বিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে ইতর কার্য্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক চরিত্রভেদে ও অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ যীশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, এবং ধর্ম্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টধর্ম্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ

স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম্ম তাহার আদর্শ-পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্ব্বিরোধী, সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রীষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখ রত, সশস্ত্র যোদ্ধ্বর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শপুরুষ সর্ব্ব কর্ম্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্ব্ব কর্ম্মে অকর্ম্মা। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্ব্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্য্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধ বধের ব্যাখ্যায় এসকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু একথা গুলি একস্থানে না একস্থানে আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

আমরা এপর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যতদূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণু জ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। * তাঁহাকেও এপর্য্যন্ত মনুষ্য

* কোথাও কোথাও কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ নামক প্রাচীন ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত তাহাও দেখিয়াছি। এ সকল স্থলে ঋষির অর্থ কি? নরনারায়ণ একটা রূপক নহে কি?

শক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয়, যে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখন তাঁহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য্য করিতেও দেখি; এপর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন, যে এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, যে এই উত্তর যথার্থ উত্তর হইল না। কেন না নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধ বধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধ বধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধের রথ খানা লইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবনির্ম্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চূড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাঁহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সূচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল।

আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হে রাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্ব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

এই ব্রহ্মার আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি, যে এইগুলি, আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্ত্তী লেখকের কারিগরি। আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য। আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণো-পাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কবিকল্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তিনি অভাবটা পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে "ধর্ম্মরক্ষার" জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও দেখি, কোথাও কিছু নাই, খানকা তাঁহারা কৃষ্ণকে "বিষ্ণো" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় না, যে তিনি বিষ্ণু বা তাদৃক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম, যে ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন

বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম, যে এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ "বিষ্ণো!" সম্বোধনের সম্ভাবিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই—সর্ব্বলোক সমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্য্যের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্ত্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আরোপ কখন ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গরুড় স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধ বধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি—আর তিনটা কথাই মূলাতিরিক্ত। বোধ হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনের অনুবর্ত্তী হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে জরাসন্ধ বধ মধ্যে

কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্ব সূচনা পরবর্ত্তী কবি প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও ঐরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে, যে এই জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ে পরবর্ত্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।

জরাসন্ধের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধ জনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারত-কার কি বলিতেছেন, শুনুন।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভি-ব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোঽনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ

সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।”

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তারে বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারত প্রণেতা অদ্ভুত রসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,

“মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কর্ম্মঠ বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণ সমীপে গদা পতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।”

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে, যে বর্ত্তমান জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া

অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিগে কিছু হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধ বধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব। সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ "যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্ব্বক" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বণিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।" "চতুর্দ্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।" (যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দ্দশ দিবসে "বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে; অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।" (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্ত্তব্য নহে)। ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ

করিলেন। তাই তখন বলিয়াছিলাম, ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান দ্বিপাদমাত্র।

তখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধ বধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না—পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন,

"রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।"

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতিপদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধ বধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপাল বধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিশুপাল বধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাদ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পূরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্য্যায়, কৃপাচার্য্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্য্যোধন উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদিরূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্য্যে

নিযুক্ত হইলেন? দুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন!

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পদ প্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আথিত্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের

অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধ চন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম হয়, তবে

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্ব পাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৫।১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতিতে, কুকুরে, ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ-ক্ষত্রিয়গণের ও পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য যে এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই।

অন্যে বলিতে পারেন, যে কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল, কৃষ্ণ ধূর্ত্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়ের অন্য অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই, যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও ও বীরোচিত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, "মহাবাহু বাসুদেব শঙ্খ চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক আরম্ভ হইতে সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।" তবে ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত রহিলেন কখন? হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ কথার আর বেশী আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই একমাত্র অস্ত্র ধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের ব্যাপারটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক

তত্ত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরু-তর ঐতিহাসিকতত্ত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি, যে জরাসন্ধ বধের পূর্ব্বে, কৃষ্ণ কোথায় মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধ বধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে। এই শিশুপাল বধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্ত্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এ মতের প্রচারকর্ত্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন, জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে এই শিশুপাল বধে, এবং তৎপরবর্ত্তী মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে, যে শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা ব্যক্তব্য যে শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান ভীষ্ম, এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের একজন নেতা শিশুপাল। শিশুপাল বধ বৃত্তান্তের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না তাহার মীমাংসার পূর্ব্বে বুঝিতে হয়, যে এই শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপাল বধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনা গুলির কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না

থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে শিশুপাল-নামে প্রবল পরাক্রান্ত একজন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডবসভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। আর রচনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয়, যে যেমন জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম দেখি। বরং জরাসন্ধ বধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য শিশুপাল বধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, যে শিশুপাল বধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্ত্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা

প্রচলিত আছে, যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রকচন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে "মালাচন্দন" বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালা চন্দন দেওয়া হয়, কেননা কুলীনের কাছে গোষ্ঠী-পতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্নপ্রকার ছিল। সভাস্থ সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়াই দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজাগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? এইকথা বিচার্য্য। ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে অর্ঘ প্রদান কর।"

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ "তেজঃ বল, ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘ দান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ,

এইজন্যই অর্ঘ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে ভীষ্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল এককালীন ভীষ্ম, কৃষ্ণ, ও পাণ্ডবদিগকে তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথমভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বাসুদেবকে পূজা করিলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকিতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য্য * মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চ্চনা কেন? ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে

* কৃষ্ণ, অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অর্জ্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য্য।

আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,—প্রথমে "প্রিয়চিকীর্ষু" "অপ্রাপ্ত লক্ষণ" ইত্যাদি চুটকিতে ধরিয়া, শেষ "ধর্ম্মভ্রষ্ট" "দুরাত্মা" প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Cimax—কৃষ্ণ ঘৃত-ভোজী কুক্কুর, দ্বারপরিগ্রহকারী ক্লীব, ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরম যোগী আদর্শ-পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল, যে তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্ত্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষ বচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা যুধিষ্ঠির আহুত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্ম্ম-কর্ত্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসা-কারিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া

ভীষ্মের সেটা বড় ভাল লাগিল না—বুড়ারা একটু খিট্‌খিটে, একটু স্পষ্টবক্তা হয়। বুড়া স্পষ্টই বলিল, "কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।"

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে আর সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্ঘের যোগ্য। আবার তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন, যে কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অর্চ্চনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন।

ভীষ্ম বলিলেন,

"এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই।"

এ গেল মনুষ্যত্ববাদ—তার পরেই দেবত্ববাদ—

"অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয় বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব,

"কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে তাহা পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া"—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ,

"সেই ভূতসুখাবহ জগদার্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

"কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ **মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গ-সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন।** দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরু স্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা, এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন।”

পুনশ্চ দেবত্ববাদ,

“কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।”

প্রথমতঃ পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে, বল, পরাক্রম ও শৌর্য্যাদিতে সকল ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু তদুচিত কৃষ্ণের কার্য্য আমরা মহাভারতে কোথায় দেখি? পাঠক মহাভারতে তাহা দেখিবেন না। মহাভারত কৃষ্ণের ইতিহাস নহে, পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। পাণ্ডবদিগের ইতিহাস কথনে, প্রসঙ্গতঃ যেখানে কৃষ্ণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই কেবল ভারতকার কৃষ্ণের কথা লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ যেখানে পাণ্ডবদিগের সংশ্রবে থাকিয়া কোন কার্য্য করিয়াছেন, কেবল সেই কার্য্যই লিখিত হইয়াছে। নচেৎ কৃষ্ণের আনুপূর্ব্বিক, জীবনী ইহাতে নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র।

এই শিশুপাল বধে, একবার মাত্র অস্ত্রধারী—তাও মুহূর্ত্ত জন্য। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখিত হয় নাই বলিয়া, পরবর্ত্তী লেখকেরা ভাগবতাদি পুরাণে ও হরিবংশে সে অভাব পূরণের চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদেরও ইচ্ছা আছে যে ক্রমশঃ সে সকল হইতেও কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিব, ইহা প্রথমেই বলিয়াছি, নহিলে কৃষ্ণচরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন ঐ সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তখন আসল বৃত্তান্ত সকল লোপ পাইয়াছিল—লেখকেরা উপন্যাসে ও রূপকের দ্বারাই অভাব পূরণ করিয়াছেন। সে সকলের ভিতর হইতে সত্যের উদ্ধার বড় কঠিন। মহাভারতই মৌলিক এবং কতকটা ঐতিহাসিক। ইহাতে আর কিছু না হৌক, তাঁহার সমসাময়িকেরা তাঁহাকে কিরূপ বিবেচনা করিতেন, তাঁহার যশঃ ও কীর্ত্তি কিরূপ তাহার পরিচয় পাই। আর স্থানে স্থানে তাঁহার কৃত কার্য্যের ও কিছু কিছু প্রসঙ্গও আছে। উদ্যোগ পর্ব্বে স্বয়ং অর্জ্জুন কৃষ্ণের যুদ্ধ সকলের একটা তালিকা দিয়াছেন, আমরা তাহার চুম্বক দিতেছি।

(১) ভোজ রাজগণকে জয় করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ।

(২) গান্ধার জয় ও রাজা সুদর্শনের বন্ধন মোচন।

(৩) পাণ্ড্যজয়।

(৪) কলিঙ্গজয়।

(৫) বারানশী জয়।

(৬) অন্যের অজেয় একলব্যের সংহার।

(৭) কংসনিপাত।

(৮) শাল্বজয়।

(৯) নরক বধ।

(৮) ও (৯) অনৈতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। আর সাতটি ঐতিহাসিক বোধ হয়। আমরা যখন গ্রন্থান্তরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন দেখাইব, যে এই কয়টিই ধর্ম্ম যুদ্ধ। ধর্ম্ম যুদ্ধ ভিন্ন কখন কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিতেন না। অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলে কখনও গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু অস্ত্র গ্রহণ করিলে, অজেয় ছিলেন। ইহাই যোদ্ধার আদর্শ। যে যুদ্ধে একেবারে পরাঙ্মুখ, যে দুরাত্মার দমনার্থও যুদ্ধে অনিচ্ছুক, আপনার বা স্বজনের বা স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধেও অনিচ্ছুক, সে আদর্শ মনুষ্য নহে। এমন লোকের প্রশংসা করিতে যাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক, আমি তাহাকে পাপাত্মা বলিব। যখন বিনা বলে ও বিনা যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার পাপের দমন সম্ভব হইবে, একজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দুইটা ধর্ম্ম কথা শুনিতে

পাইলেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সেণ্ট হেলেনায় বাস করিবে, একজন তৈমুরলঙ্গ একজন ব্রাহ্মণের পাকা দাড়ি দেখিলেই প্রণাম করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে, এমন সময় কখন পৃথিবীতে আসিবে কিনা, বলিতে পারিনা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন আসে নাই, এবং ভবিষ্যতে আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ (১) যিনি বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদ বেদাঙ্গ-পারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ কি, তাহা বলিলাম। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনিষী কর্ত্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যথাকালে

এ কথার সবিস্তারে বিচার করা যাইবে। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন—যথা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যেও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্য রূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বধ।

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ

অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া, সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমুলোন্মূলন কবিবার নিমিত্ত অদ্যই সমর সাগরে অবগাহন করিব।' চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।"

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষ প্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপাল বধের ইহাই যথার্থ কারণ; শিশুপালকে

বধ না করিলে, তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে যে শিশুপালোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই সময়ে উক্ত হয়, কিন্তু এই স্থানে পাঠক পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের বাল্যলীলার অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও স্মরণ করুন। এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী। দুইটী বিরোধী কথা যখন মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহার একটা প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব। যখন দুইটি কথার মধ্যে একটী অনৈসর্গিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনায় পূর্ণ, আর একটী স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত, তখন যেটী স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত সেইটিই বিশ্বাসযোগ্য। পাঠক যদি এ মীমাংসার যাথার্থ্য স্বীকার করেন তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাস বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না।*

* তিরস্করণ কালে শিশুপাল কৃষ্ণকে কংশের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন দেখা যায়। যদি তাই হয়, তবে কৃষ্ণ মথুরায় প্রতিপালিত, নন্দালয়ে নয়।

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশী গালি দিলেন। "দুরাত্মা" "যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে," "গোপাল," "দাস" ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাস যোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটী চক্ষু ও চারিটী হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দ্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার পিতামাতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাঁহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।"

কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়া দাও না?" এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের plot-interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, "যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।"

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়, কেন না উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর 'জন্মগ্রহণ করিয়াছেন' কথাতেও ঐরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসী মা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, "বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।" কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন,

শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমা গুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণায় কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুর বধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুর বধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র রূপ রত্ন ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকত কটূক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়া-

ছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হৌক পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাত সাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যতদিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলী দিতে প্রস্তুত হইল, ততদিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোক ক্ষয় হয় বলিয়া নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যতদিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, ততদিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার

অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগ পর্ব্বের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্য্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যীশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মার্জ্জনা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না।

তার পর ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই

তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।” শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহাঁরা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।” ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।” শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।” ভীষ্ম উত্তর করিলেন, “যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।”

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই ;—“ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাঁহার মরণ কণ্ডূতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?”

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে?

শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না। এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে, যে তিনি পিতৃস্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণও বলবান্, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ

গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃষ্বস্পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সুসঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্য শরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল। চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞা মত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের

প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না, যে তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন, যে স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্র স্মরণ বৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষ যুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগ পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র শিশুপাল বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা,

"পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ বিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীর পুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, ও

যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এবং করূষরাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।"

১২ অধ্যায়।

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষ যুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচর বর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে একগ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই, একটি নৈসর্গিক অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম,

তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষ-বিশিষ্ট। তবে অর্জ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘ্নদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্য্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞ রক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বন ও বিরাটপর্ব্ব।

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্ব্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে একস্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে—সে কথাটা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষন, এবং সভা মধ্যে বস্ত্র হরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ। কিন্তু কাব্য এখন আমাদের সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভা মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"তদনন্তর দুঃশাসন সভা মধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষন করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হে গোবিন্দ!

হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর! হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বভাবন্! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর।' সেই দুঃখিনী ভাবিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। * এ দিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ করে ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্মপ্রভাবে নানারাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল।"

ইহার মধ্যে দুইটী পদ প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক—"গোপীজনবল্লভ।" এবং "ব্রজনাথ।" এই স্থানটিকে যদি মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত স্বীকার করা যায় এবং উহা যদি ব্যাসদেব বা অন্য কোন সমকালবর্ত্তী

* আসেন নাই।

ঋষি প্রণীত হয়, তবে তন্মধ্যে এই দুইটি শব্দ থাকাতে কৃষ্ণের ব্রজলীলা মৌলিক বৃত্তান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।

এ রকম কাপড় বাড়াটা বড় অনৈসর্গিক ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অলীক এবং অনৈতিহাসিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার আমাদের অধিকার আছে। যাঁহারা বলিবেন, যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যাহা করেন তাহা স্বপ্রণীত নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারাই সম্পন্ন করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু ইহা নৈসর্গিক ক্রিয়া ভিন্ন অনৈসর্গিক উপায়ের দ্বারা করিয়াছেন, ইহা কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা বলিবেন, কলিযুগে হয় না, কিন্তু যুগান্তরে হইত, তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে জগৎ চিরকাল এক নিয়মেই চলিতেছে। যদি তাহার অন্যথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জাগতিক নিয়ম সকল পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।

এক্ষণে, মহাভারতের মৌলিক অংশ যদি কোন সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা যায়,

তবে স্পষ্টই এই বস্ত্রবৃদ্ধি ব্যাপারটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেন না কোন সমকালবর্ত্তী লেখকই এত বড় মিথ্যাটা প্রচার করিতে সাহস পাইতেন না। তখনকার আর্য্যবংশীয়গণ এখনকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের মত যদি নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ হইতেন, তাহা হইলেই এ সাহস সম্ভব।

আর যদি মৌলিক মহাভারত সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত না হয়, যদি তৎপ্রণেতা অনেক পরবর্ত্তী হন, তাহা হইলে মৌলিক মহাভারতে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিতে পারে, কেন না তাঁহাকে কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এবং কিম্বদন্তীর সঙ্গে অনেক মিথ্যা কথা জড়াইয়া আসিয়া পড়ে। কিন্তু মৌলিক মহাভারত যদি পরবর্ত্তী ঋষি প্রণীত হয়, তাহা হইলে যে অংশ অনৈসর্গিক তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য।

আমরা মহাভারতে যেখানে যেখানে ব্রজলীলা প্রাসঙ্গিক এইরূপ কোন কথা পাই, সেইখানেই দেখি যে তাহা কোন অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গে গাঁথা আছে। সুভদ্রা হরণ, বা দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের ন্যায় প্রকৃত এবং নৈসর্গিক ঘটনার সঙ্গে এমন কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না ; চক্রাস্ত্র দ্বারা শিশুপাল বধ, বা দ্রৌপদীর বস্ত্র

বৃদ্ধি প্রভৃতি অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গেই এরূপ কথা দেখি। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত ন্যায্য হয় পাঠক তাহা করিবেন।

তার পর বনপর্ব্ব। বনপর্ব্বে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছু মাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছু মাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ! যে যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন, যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, একথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকা-দিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি

থাকিলে এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।”
তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদা কাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্রও নহে, কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। ভরসা করি কোন পাঠক এসকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পরে দুর্ব্বাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার। তাহারও কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে।

তার পর বনপর্ব্বের শেষের দিকে মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে, ছোট ঠাকুরাণীটী সঙ্গে। মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়

একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না তাহা আমাদের বিচার করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন. উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কিছু সম্বন্ধ নাই। বড় মনোহর কথা, কিন্তু সকল গুলি কথা উদ্ধৃত করা যায় না।

তাহার পর বিরাটপর্ব্ব। বিরাটপর্ব্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন. তাহা উদ্যোগপর্ব্বে আছে। উদ্যোগপর্ব্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

অষ্টম অধ্যায়।

যুদ্ধোদ্যোগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সৈন্যোদ্যোগ।

এক্ষণে উদ্যোগ পর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্ব্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজের একটী মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মত এই ঃ—যে দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটী মত এই যে অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটী পরস্পর বিরোধী—কাজেই দুইটী মতই যথার্থ হইতে পারে না।

অথচ দুইটীর মধ্যে একটী যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটী অতি কঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খৃষ্টধর্ম্ম বলে সকল অপরাধ ক্ষমা কর, তাহাদিগের রাজনীতি বলে সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এ জন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগ পর্ব্ব মধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগ পর্ব্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন; এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযুজ্য তাহার বিচার

কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে, যে আইন আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূটতর্ক উঠিয়া থাকে। কার্য্যতঃ প্রায় এই দেখিতে পাই, যে যে বলবান, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়; যে দুর্ব্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান অথচ ক্ষমাবান, তাহার কি করা কর্ত্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি পাঠকেরা সকলেই জানেন, যে পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাত-

বাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাট রাজের পুরী মধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস সম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয় তবে কি করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহা-দিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়া-

ছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাট রাজের সভায় আসীন হইলে পাণ্ডব রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইয়া তারপর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্করও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না, যে যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেননা হিত, ধর্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত একটী গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।" আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যে আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার

এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজ বিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করত ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, যে সন্ধিদ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু

যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোত্থান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও 'parliamentary procedure' ছিল) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহা বলবান বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যে টুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য।

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা। দ্রুপদও

সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন, যে দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।" গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন, যে যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, "তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন,"

অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধের নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্য অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম, যে তিনি কৌরবপাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিগে উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুইজনে একদিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক সমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর

বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্বুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমর পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমর পরাঙমুখ হইবেন,

শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙ্মুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।''

উদ্যোগ পর্ব্বের এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা এই কয়টী কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট, যে বল প্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য

আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্ব্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তার পর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শ-পুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ব্বদোষশূন্য এবং সর্ব্বগুণান্বিত।

নবম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সঞ্জয়যান।

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেন না বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণকে* ধৃতরাষ্ট্রের বড়

* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ এই উদ্যোগপর্ব্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?" (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, "সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি: কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।" আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন, "কিন্তু কেশবও অধৃষ্য, লোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্মা। যিনি সর্ব্বলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?" এইরূপ অনেক কথা আছে।

ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। "তোমাদের রাজ্যও আমরা অধর্ম্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা যুদ্ধ ও করিওনা, সে কাজটা ভাল নহে ;" এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডব সভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই যে যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম্ম, তোমরা সেই অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যে টুকু প্রয়োজনীয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহু সংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্ত্তব্য। মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা এবং

চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয় বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধি প্রভাবেই শত্রু দমন পূর্ব্বক সুহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবল-পরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্ত্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বভ্রু উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারি দান করে তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম নিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।”

বাসুদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশি সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয় ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উঁহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি, সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য

কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজনপরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্ম্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত গীতা পর্ব্বাধ্যায়েই আছে। এখন এমন বিচার উঠিতে পারে, যে গীতায় যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণ প্রচারিত কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্য ক্রমে আমরা গীতাপর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে,

তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই ধর্ম্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার যে ধর্ম্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্ম; তবে বলিব এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

"শুচি ও কুটুম্ব পরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন করিবে, এই রূপ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে,

তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিবা মাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চারন করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিত-বলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশ দিক ও নভোমণ্ডল বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন।

ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডই কর্ম্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে কর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি কর্ম্ম শব্দের পূর্ব্ব প্রচলিত অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।* আর এই খানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

---

* আমি স্বীকার করিতেছি "ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ" ইত্যাদি দুই একটা গোলোযোগের কথা গীতাতেও আছে। তাহার মীমাংসা গ্রন্থান্তরে করিবার ইচ্ছা আছে।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্ব্বাহের (অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম্ম পালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম পালনে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

"হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তা। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথ চালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণ হিংসা না করিয়া ভীমসেনকে শান্তনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে ধর্ম্ম রক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহাঁরা যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন তাহা ও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধি সংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।"

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের

যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, যে গীতোক্ত ধর্ম্ম, এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম্ম, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম্ম কিছুই নাই। উহার নাম "Conquest," "Glory," "Extension of Empire" ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শুধু এক "Gloire" শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রীক তিনবার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয়, যে এইরূপ "Gloire" ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর, ছোট চোর।*

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়,

কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেননা দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে, যে আর্য্য ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল Diogenes মহাবীর আলেক্জণ্ডরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি একজন বড় দস্যু মাত্র।" ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

"তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও একপ্রকার তস্কর কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।"

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়,

সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্য্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি—কেননা রাজনীতিজ্ঞ নহি।

তাহা ও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্ম্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, "তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।" কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্ত্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্ব্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন, যে উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, "যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।"

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্ম্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্য শক্তিতে দুষ্কর কর্ম্ম, কেননা এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি

নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যানসন্ধি।

এইখানে সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্ব্বাধ্যায় আছে ; "প্রজাগর" "সনৎসুজাত" এবং "যানসন্ধি।" প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতি কথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্ব্বাধ্যায় আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই।

যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং

অনেক সময়ে নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহার কিয়দংশ মৌলিক সন্দেহ নাই, সকলই যে মৌলিক, এমন বোধ হয় না। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুইস্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জ্জুনবাক্য সঞ্জয় মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর।"

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, যে তিনি পাটিপি পাটিপি, —অর্থাৎ চোরের মত, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কৃষ্ণার্জ্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন! কথাবার্ত্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দম্ভের কথা বলিলেন,—বলিলেন "আমি যখন সহায় তখন অর্জ্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।"

তার পর অর্জ্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে "অনন্তর মহাবীর কিরীটি তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।" এই কথায় পাঠকের

এমন মনে হইবে, যে বুঝি ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জ্জুন যাহা বলিলেন,তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিগ দিয়া ঊনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিছু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্য্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা, চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে অর্জ্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তমঅধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জ্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই, যে ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এইকয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া একপদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায় গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তমঅধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্ত্তী এই অধ্যায় গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত! অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে, যে ইহা যে কেবল অপ্রা-

সঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুর-নিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্রে উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য এই ক্ষুদ্র অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্ব্বে যাঁহাকে মদ্য পানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয় বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয় বাক্যে এমন কিছুই নাই, যে তাহার বলে আমা-দিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল। এইখানে আমরা কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিলাম। ইহার পর ভগবদ্যান পর্ব্বাধ্যায়। সে অতি বিস্তৃত কথা—